গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ ॥ ১ । ২০২১
সংখ্যা-১, প্রকাশ-মার্চ ২০২১/ চৈত্র ১৪২৭

বই পর্যালোচনা

চৌধুরী শহীদ কাদের
ভ্রমণকাহিনী নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী

গণহত্যা জাদুঘর রাষ্ট্র রাজনীতি ও আধিপত্য অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের লেখা একটি ভ্রমণ কাহিনী, তবে গভীরভাবে দেখলে, এটি ভ্রমণ কাহিনীর চেয়েও বড় একটি ক্যানভাস বলে মনে হবে।

ভ্রমণ মানেই আমাদের কাছে কাঁধে ব্যাগ, মুঠোফোনে ম্যাপকে সঙ্গী করে নায়াগ্রা জলপ্রভাত, আইফেল টাওয়ার, পিরামিড কিংবা সেন্ট মার্টিন, সাজেক। শান্ত পাহাড়ের নিস্তব্ধতা থেকে সুবিশাল সমুদ্র, প্রাচীর নগরী থেকে প্রবাসের অলিগলি-আনন্দ, প্রশান্তি, অজানাকে জানা সব মিলিয়ে অপার আনন্দের হাতছানি। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের এই ভ্রমণ কাহিনীটিও শুরু হয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা দিয়ে, এরপর গল্প এগিয়েছে বার্লিন, কিয়েভ, সারায়েভো, ক্রাকো, হ্যানোভার, ভিয়েনা, ওয়াশিংটন এবং সবশেষে নমপেনে।

তবে সাধারণ ভ্রমণ কাহিনীর সাথে এই বইটির তফাৎ এটি ডার্ক ট্যুরিজম নিয়ে লেখা। একজন ডার্ক ট্যুরিস্ট হিসেবে ইতিহাসের কিংবা পর্যটনের অন্ধকার স্মৃতিগুলোকে প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন ইতিহাসের ভিন্ন একটি অধ্যায়। ডার্ক ট্যুরিজম বিষয়টি একটু নতুন। মৃত্যু এবং যন্ত্রণার সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখাকে ডার্ক ট্যুরিজম বা ব্লাক ট্যুরিজম বলা হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত ডার্ক ট্যুরিজমের ওপর প্রথম বই এটি।

অন্নদা শঙ্কর রায়, একমাত্র প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক যার হাতেখড়ি হয়েছিল ভ্রমণ সাহিত্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন, 'ভ্রমণ থেকেই হয় ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু ভ্রমণকারীদের সকলের হাত দিয়ে নয়।'

মুনতাসীর মামুনের হাত হচ্ছে সেই হাত, যার জন্ম হয়েছিল ভ্রমণ সাহিত্য লেখার জন্য। লেখকের ভ্রমণ বাতিক ছিল সেই শৈশবেই রক্তের কনায় কনায়। নিজের ছোটখাট বেড়ানোর ভ্রমণ গল্পগুলো লিখেছেন কত সাবলীল ভাবে। তার আগ্রহ ছিল ভ্রমণকাহিনী পড়ার দিকে। তাই তার সাহিত্যে ধরা দেয় এক পর্যটকের দৃষ্টি।

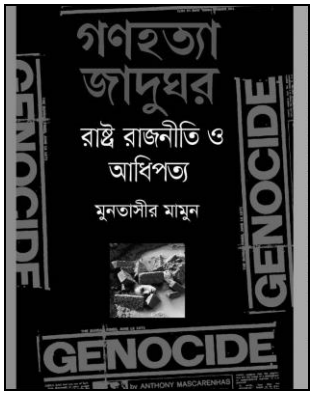

মুনতাসীর মামুন খুব সাধারণ ভাষায় ইতিহাস লিখে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। অনেকেই বলেন অধ্যাপক মামুনের ভাষা গবেষণার ভাষা নয়, তিনি গল্পের ভাষায় ইতিহাস লিখেন। সম্ভবত ঠিক এই অযোগ্যতাই সবচেয়ে বড় প্রভাবক হয়ে কাজ করেছে তাঁর জীবনে। সহজ ভাষায় ইতিহাস রচনা করে তিনি সাধারণ পাঠককে ইতিহাসে আকৃষ্ট করেছেন। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খানের একটি মন্তব্য যথার্থ বলে মনে হয়, 'মুনতাসীর মামুনের মানসপট নির্মিত হয়েছে থিওরি ও প্র্যাকটিসকে ঘিরে। আমি মুনতাসীর মামুনের লেখার ভক্ত, বিশেষ করে ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধসমূহ আমাকে মুগ্ধ করে, যেগুলো গল্পের আদলে লেখা।

ইতিহাসের মতো গুরুগম্ভীর বিষয়কে গল্পের মতো করে হাল্কা মেজাজে উপস্থাপন একটি শৈলী নয় কি?'

লেখালেখিতে তিনি কোনদিন গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করেননি। তার রচনাশৈলী অসাধারণ। একথা শাব্দিক অর্থেই। কারণ তাঁর মতো বর্ণনাভঙ্গি আর কোন ভ্রমণকাহিনীতে পাওয়া যায় না। নিজস্ব রচনাভঙ্গিতে এই গ্রন্থে তিনি যেভাবে পরিপার্শ্বের দৃশ্যমান জগতকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সেটি দুর্লভ বিষয়।

মুনতাসীর মামুনের এই বইটি পড়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণ কাহিনী পালামৌর লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়নটি মনে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সঞ্জীব কৌতুহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীন চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।

লেখক এই বইয়ে বসনিয়ার সারায়েভোর একটি সন্ধ্যার স্মৃতিচারণ করছেন। সদ্য পরিচিত জালকো জিভকভিক নিয়ে তিনি ব্রাভডাজিলুকের পারভিজের এন্টিকের দোকানে গিয়েছেন। লিখেছেন তিনি, মোটাসোটা প্রবীণ দোকানের মালিক, নাম সালমা। জালকো বললেন, সালমার বর ছিলেন তার বন্ধু, সেই সূত্রে সালমাও। আবার তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সালমার বন্ধু। বলা যেতে পারে বন্ধু দু' দম্পতি। যুদ্ধে সালমার স্বামী ও তার [জালকোর] স্ত্রী নিহত হন। সালমার একটি মেয়ে আছে। মা মেয়ে এই দোকান খুলেছেন। তিনি সালমার বন্ধু হিসেবে তাকে যথাসাধ্য সহায়তা করেন। জালকো যাই বলেন, এতটা বয়স হয়েছে, কোনটি নিছক বন্ধুত্ব, কোনটি হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাঁধা বন্ধুত্ব বুঝতে পারি। আসলে সব দেশে যা হয়, বসনিয়ায়ও তাই হয়েছে। অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক দম্পতি নিজের সঙ্গী হারিয়েছেন। শান্তি ফিরে এলে যখন জীবন শুরু করেছেন তখন দেখেন একেলা, নির্ভর করার মতো কেউ নেই। তখন এই ধরনের সম্পর্কের সৃষ্টি, আমি জানি জালকো ও সালমা বিয়ে করবেন না। আলাদা থাকবেন, কিন্তু নিঃশব্দে ভালোবাসবেন যে ভালোবাসা খালি সোচ্চার তাদের দু' জনের মাঝে। খারাপ কী? জীবনতো এরকমই।

ডার্ক ট্যুরিজমের বিষাদময় ইতিহাস, রক্ত আর সংঘাতের বিবরণ সাথে চমৎকার উপস্থাপন শৈলী। লেখকের কৃতিত্বতো এখানেই।

গ্রন্থটির শুরু হয়েছে লেখকের নেতৃত্বে একটি জাদুঘর নির্মাণের গল্প দিয়ে। পাঠক ভাবতে পারেন, একটি জাদুঘর নির্মাণ এর সাথে রাষ্ট্র, রাজনীতি কিংবা আধিপত্যের কি সম্পর্ক?

এটি কোন সাধারণ জাদুঘর নয়। একটি বিশেষায়িত জাদুঘর, আমাদের স্মৃতির ওপরে জমে ওঠা পলিমাটি সরাতে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ২০১৪ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই জাদুঘর নির্মাণে হাত দেয়। উদ্দেশ্য ছিল একাত্তরে বাংলাদেশে ভয়াবহ গণহত্যার বিস্মৃত ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরবেন।

একটি দুই রুমের ভাড়াবাড়িতে শুরু করেছিলেন এই জাদুঘরের কার্যক্রম। সেখানে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্য লাভ, বাড়িসহ জমি প্রদান, ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, নতুন করে জাদুঘর শুরু করা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্প নেয়া। সব মিলিয়ে মাঝখানের প্রায় সাত বছরের একটি অন্যরকম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেছেন প্রথম অধ্যায়ে। লেখক লিখছেন সেই অভিজ্ঞতা, গণহত্যা জাদুঘর জায়গা পেল। পরিচিত

হতে লাগল। ছোটো খাটো আমলাদের কতো অপমান সইতে হয়েছে বলার নয়। এরা ছিলেন ডেপুটি, জয়েন্ট সেক্রেটারি পদের।

জাদুঘর নির্মাণের পাশাপাশি জাদুঘরকে কেন্দ্র করে গণহত্যার ইতিহাস সংরক্ষণে নানা প্লাটফর্মে যে কাজগুলো হচ্ছে তার বর্ণনাও প্রথম অধ্যায়ে উঠে এসেছে।

আমাদের সীমিত সামর্থ্যে আমরা এসব স্থানে প্রায় ৫০টি ফলক লাগিয়েছি। এবং আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, তৃণমূলের মানুষজন এতে উজ্জীবিত হয়েছে। যারাই ফলকটি দেখছেন, থামছেন ও ফলকের লেখা পড়ছেন। খুলনা সার্কিট হাউসের সামনে আমরা একটি ফলক লাগিয়েছি। তাতে ১৯৭১ সালে সার্কিট হাউসে নির্যাতন কেন্দ্র ও হত্যার কথা লেখা আছে। এটি লাগাবার সময় তৎকালীন ডিসি মৃদু আপত্তি করেছিলেন। আমরা গ্রাহ্য করিনি। একদিন সকালে দেখি, এক রিকশাঅলা রিকশা থামিয়ে লেখাগুলি পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কী' হইছে এখানে। আমরা কিছুই জানি না। এখন জানলেন। ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। এভাবে বর্তমান যুক্ত হচ্ছে ইতিহাসের সঙ্গে, অতীতের সঙ্গে।

এটিকে ভ্রমণ কাহিনী বললেও প্রথম অধ্যায়টি মূলত লেখকের একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রতিবন্ধকতা আবার কখনো তাদের সহায়তার বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিতে কীভাবে কাজ করতে হয়। প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করতে হয় রয়েছে সেসববের বিবরণ। অনেকটা গণহত্যা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এটি।

বার্লিনে জাদুঘর দেখার অভিজ্ঞতা, কবি দাউদ হায়দারের সাথে সাক্ষাৎ, বুটিক হোটেলের বিবরণ সব মিলিয়ে বইয়ের সবচেয়ে আর্কষনীয় অধ্যায় 'বার্লিনে জাদুঘরে জাদুঘরে'। বার্লিনের জাদুঘরের বর্ণনায় প্রথমেই রয়েছে মেমোরিয়াল টু দি মার্ডারড জু বা হলোকাস্ট মেমোরিয়াল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। একজন ইতিহাসের অধ্যাপক যখন জাদুঘর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখেন, সেটি তখন আর ভ্রমণ কাহিনী থাকে না। হয়ে উঠে ইতিহাস পাঠ। হলোকাস্ট মেমোরিয়ালের বর্ণনায় তাই সহজাতভাবে উঠে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি, ভূর্গভস্থ জাদুঘরের নানা স্মারক নিয়ে বিশ্লেষণ।

এরপর জিউস মিউজিয়াম ভ্রমণের বর্ণনা কিংবা ইতিহাস। বার্লিনে এরপরের গন্তব্য অ্যানা ফ্রাঙ্কের জাদুঘর। রোজেনথালেস্ট্রাসের অ্যালেস উবার অ্যান মিউজিয়ামের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে এই অধ্যায়ে।

বার্লিন স্টোরি মিউজিয়াম বা বাংকার মিউজিয়াম হচ্ছে লেখকের বার্লিনে দেখা শেষ মিউজিয়াম। মজার বিষয় অধ্যাপক মামুনের এই বইয়ের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। পাঠক বইটি পড়লেই বার বার খুঁজে পাবেন আমাকে। জাদুঘর নির্মাণের শুরু থেকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি কি পরিমাণ অধ্যবসায় ও শ্রম তিনি দিয়েছেন এই জাদুঘর নির্মাণে। আমরা প্রায় ১৩০ বার খুলনা গিয়েছি এই জাদুঘরের কারণে। বার্লিন থেকে কিয়েভ, ওয়ারশ কিংবা নমপেন আমার শিক্ষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাঁর এই কনিষ্ঠ ছাত্রকে পাঠক খুঁজে পাবেন বারংবার।

অধ্যাপক মামুন নিবেদনে লিখেছেন, খুলনার গণহত্যা- নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর গড়ায় গত সাত বছর প্রতিদিন আমার সঙ্গে ছিলেন চৌধুরী শহীদ কাদের।

কিংবা শহীদ ইন্টারনেট খুঁজে অ্যানা ফ্রাঙ্কের এক জাদুঘরের খোঁজ আনল।

...বাংকার জাদুঘরের কথা বলতে হয়। শহীদই বলেছিল এটির কথা।

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের হলদোমোর জেনোসাইড মিউজিয়াম দেখা, হলদোমোরের ইতিহাস, কেন এটি গণহত্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে 'কিয়েভ ও হলদোমোর জাদুঘর' অধ্যায়ে। 'সারায়েভোতে সন্ধ্যা' মূলত বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোর ২টি জাদুঘর দেখার অভিজ্ঞতা পাশাপাশি শান্ত-শুভ্র সারায়েভো শহরের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা। বিশেষ করে সারায়েভোর মিউজিয়াম অব ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি অ্যান্ড জেনোসাইড ও ওয়ারচাইল্ড হুড মিউজিয়ামের ইতিহাস সমৃদ্ধ আলোচনা শুধু জাদুঘর নয় পুরো বলকান যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারবে পাঠক।

জাদুঘরের পাশাপাশি একাধিক কনসেনট্রেশন ক্যাম্প পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই গ্রন্থে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প পোলান্ডের অসউইৎস, চিলির পাশে উত্তর জার্মানীর বের্গেন-বেলসেন, অস্ট্রিয়ার মাউথ হাউসেন কিংবা কম্বোডিয়ার নমপেনের সিকিউরিটি জেল। ইতিহাস, জাদুঘরের স্মারক, শহরের বর্ণনা পাঠক মাত্রই বিচলিত হবে রক্ত আর অশ্রুর এই ইতিহাসে।

লিখেছেন অধ্যাপক মামুন, আমরা তিনজনই নীরব। বাইরে ঢাকার বৈশাখের রোদ। বিষন্ন মনে গাছে ঢাকা রাস্তার দিকে এগোই। এ পথ দিয়েই বেরুতে হবে। গাছের ছায়ায় টেবিল পেতে তিনজন বসে। টেবিলে বই। বই উল্টে পাল্টে অবাক হই। এরকমটি আর কোথাও দেখিনি। তুয়োল শ্লেং যন্ত্রণালয় থেকে সাতজন বেঁচে ছিল বা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এস. ২১ এ ২০,০০০ এর বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাস এদের মধ্যে অনেকে ছিল খেমর রুজের ক্যাডার, বর্তমান সরকার বিরোধী। অথচ তাদের [হত্যার জন্যই] স্মরণেই এই জাদুঘর করা হয়েছে। যে সাতজন বেঁচে ছিল তাদের একজন ছিলেন মিস্ত্রি, একজন ভাস্কর, একজন শিল্পী, বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ও অন্য তিনজনের পরিচয় সাধারণ। জাদুঘরে এদের একজন ভাস্কর আইএম চানের পলপটের করা একটি ভাস্কর্য আছে যা ঐ সময় তাকে দিয়ে বোধহয় করানো হয়েছিল।

পাশাপাশি প্রায় ২০ বছর আগে দেখা ওয়াশিংটনের হলোকাস্ট মিউজিয়াম দেখার একটি বিবরণও রয়েছে এই গ্রন্থে।

মুনতাসীর মামুন গল্প বলছেন। ভ্রমণের গল্প, গণহত্যা-নির্যাতনের অন্ধকার গল্প। সাথে ইতিহাসকে টেনে আনছেন। আবার কখনো কম্পোডিয়ার সাথে কখনো হলোকাস্টের সাথে সংযুক্ত করছেন বাংলাদেশ গণহত্যাকে। কিন্তু লেখকের স্বকীয়তা স্টোরি টেলিং এর পাশাপাশি তিনি দেখানোর কাজটিও করেছেন।

গল্প বলার পাশাপাশি দেখানোর এই বৈশিষ্ট্য পাঠককে আরো আকৃষ্ট করছে। আপনি কী দেখছেন, কী শুনছেন, খাবারের স্বাদ যেমন ছিল, কী অনুভব করেছেন এরকম বিষয়গুলো লেখকের চোখ দিয়ে লিখনিতে পাঠককে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দেখিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। মুনতাসীর মামুন ভ্রমণ গল্পে ভীষণ রকম মুজতবা অনুসারী।

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রসঙ্গ যখন আসল হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ মনে পড়ল। ভিন দেশে যখনি কোন খাবার হোটেলে আমার শিক্ষকের সাথে প্রবেশ করি। অধ্যাপক মামুন দেখেন বাকী টেবিলের লোকজন কি খাচ্ছে। সম্ভবত ট্রেডিশনাল ফুড কি সেটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা! সারায়েভোতেও সেটা হয়েছে। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। লোকজন রুটি আর ল্যাম্বের মাংসের অদ্ভুত এক কাবাব গোগ্রাসে গিলছে। এই বইয়ে তার নাম জানলাম 'সেভাপিসিমি আর সালতা'। যাই হোক মুজতবা আলীর কথায় ফিরে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর দিকে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'জলে ডাঙ্গায়' পড়েছিলাম। চেন্নাই বন্দর থেকে বেশ কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণের মুগ্ধকর বিবরণে গ্রন্থে কায়রোতে হোটেলে শসা খাওয়ার কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায়।

পাশের টেবিলে দেখি, একটা লোক তার প্লেটে দুটি শসা নিয়ে খেতে

বসেছে। দুটি শসা– তা সে যত তিন ডবল সাইজই হোক না– কি করে মানুষের সম্পূর্ণ ডিনার হতে পারে, বহু চিন্তা করেও তার সমাধান করতে পারলুম না। এমন সময় দেখি, সেই লোকটা শসা চিবুতে আরম্ভ না করে তার মাঝখানে দিল দুহাতে চাপ। অমনি হড়হড় করে বেরিয়ে এল পোলাও জাতীয় কি যেন বস্তু, এবং তাতেও আবার কি যেন মেশানো। আমি অবাক। হোটেলওলাকে গিয়ে বললুম, 'যা আছে কুলকপালে, আমি ঐ শসাই খাব।

সারায়েভো রুটিগুলো যেন সেই শসার মত চাপ দিলে বের হয় সুস্বাদু তুলতুলে ভেড়ার মাংস।

গণহত্যা জাদুঘর রাষ্ট্র রাজনীতি ও আধিপত্য গ্রন্থটির প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স। ১৭৪ পৃষ্ঠার হার্ড বোর্ডে বাঁধানো বইটির দাম তিনশত টাকা। বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন ধ্রুব এষ। বইটি উৎসর্গ করেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের প্রিয় ছাত্রী ড. মুর্শিদা বিন্‌তে রহমানকে। যারা ভ্রমণ কাহিনী পড়তে পছন্দ করেন, পড়তে পারেন। লেখকের সঙ্গী হয়ে নিতে পারেন ভ্রমণ গল্পে ইতিহাসের পাঠ। মিউজিওলজির ছাত্রদের কাছে অবশ্য পাঠ্য একটি আকর গ্রন্থ। ইতিহাসের ছাত্ররা পড়লে জানবে কোন চোখ দিয়ে জাদুঘর দেখতে হয়। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের লেখনিতে পাঠকের বার্লিন থেকে সারায়েভো হয়ে নমপেনে যাত্রা। ইতিহাসের সাথেই যেন পথচলা।